Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 151 – 262
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মোরশেদুল আলম
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : malam2031973@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Liberation war, Bangladesh, the novel, Humayun Ahmed, bloody, Bright Consciousness, Pakistani, Demonic, Invader, Freedom fighter.

Abstract

As the glorious liberation war of Bangladesh which took place in 1971, has established the entire Bengalis as an independent and sovereign nation on the world map, it also influenced the art, literature and culture of Bangladesh. Just as the glorious motivation and bright spirit of the liberation war had a deep influence on the creative consciousness, mind and spirit of our writers in the post-independence period, it also widened the horizons of their intellect, understanding, knowledge, experience, expectations and dreams. However, in comparison, our novelist have been more able to create the inevitable art form of the liberation war in the elaborate art of the novel than in poetry-drama-short story-music-essay or other branches of literature. Although the number of novels written in the background of Bangladesh's liberation war is abundant, in most of the novels, the identity of the novelists' real experience and experience and the chemical synthesis of the sense of life is negligible. However, the sensitivities with deep life outlook and positive life consciousness and the depth of social observation, time-bound and timeless, have made the novels of the writer into incomparable and distinctive works of art, among those whose name is uniquely significant, whose novelworld is bright with promise, is Humayun Ahmed (1948-2012). His 'Shyamal Chhaya' (1973), 'Nirbashan' (1974), 'Saurav' (1984), 'Surjer Din' (1985), '1971' (1986), 'Aguner Parashmani' (1985), 'Anil Bagchir Ekdin' (1992), 'Jochona O Jananir Golpo' (2004) etc, The brilliant application of the multi-dimensional aspects of the Great Liberation War of Bangladesh is also noteworthy in the language and presentation style used by him in the gospels. The all-consuming horrors, cries, heartbroken bloodshed, uncertain futures and fears of the Bengali nation during the War of Independence And just as he has painted the picture of terror with extraordinary artistic skill, he has brought to the fore the boundless heroic stories of the golden-born freedom fighters of Bengal, amazing courage and pure patriotism, and the vicious barbarism of the Pakistani invaders and bandits and their domestic allies Razakars, Al-Badr and Alshams, women torture,rape, plunder, hellish glee and their cruelty. The nature and characteristics of the great blood-soaked Liberation

War of Bangladesh, which took place in 1971, are reflected in the above novels of writer Humayun Ahmed, and the drawing of itsform and transformation is the subject of the present research-article.

Discussion

এক

দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালির অপরিমেয় আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ বাঙালি জাতির জীবনে এক মহত্তম প্রাপ্তি। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ যেমন সমগ্র বাঙালিকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব-মানচিত্রে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও। তুলনাসূত্রে উল্লেখ্য, কবিতা-নাটক-ছোটগল্প কিংবা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা উপন্যাসের সুবিস্তৃত শিল্প-অবয়বেই আমাদের কথাশিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য শিল্পরূপ নির্মাণে বেশি মাত্রায় সমর্থ হয়েছেন। কথাসাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য এবং বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ শিল্পিত মাধুর্যে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের বরেণ্য ও কৃতী লেখকেরা। ঔপন্যাসিকদের অনেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কেউ-বা পরোক্ষভাবে। দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক-হানাদার বাহিনীর নির্বিচারে পীড়ন-নির্যাতন ও গণহত্যার মধ্যে বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ, সংগ্রাম ও যুদ্ধ বাঙালি ঔপন্যাসিকদের অনুপ্রেরণার প্রাণ-উৎস। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য –

> "গণহত্যার মুখে ও মুক্তিযুদ্ধের আগুনের মধ্যে লেখকরা দুইটি প্রধান ক্ষেত্রে ছিটকে পড়েছিলেন - এক, কিছু সংখ্যক যাঁরা আত্মরক্ষার্থে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দুই, যাঁরা দেশের ভিতরে থেকে গেলেন শহরে বা জনপদের ভিতরে। প্রথম দল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠন। তাঁরা সভা-সমিতি করেছেন, লিখেছেন, ভ্রমণ করেছেন। ...অপরপক্ষে যাঁরা দেশের ভিতরে ছিলেন তাঁরাই অভিজ্ঞতার সত্যিকারের ভাণ্ডারী, কারণ তাঁরা যেখানেই থাকুন, শহরে কিংবা গ্রামে, এ-সমস্ত আলোড়নের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন ঝটিকা-উত্তল নদীর ভিতরে যেমন মাছ। তাঁরা শত্রুপক্ষের অপারেশন দেখেছেন, গণহত্যা দেখেছেন, মৃত্যুর মুখোমুখি প্রতি মুহূর্তে তাঁরা বেঁচে থেকেছেন। তাঁরা দেখেছেন ঘৃণা, দুর্জয় প্রতিরোধ; দেশের জন্য, আদর্শের জন্য, মানবতার জন্য আত্মত্যাগের অপার মহিমা। অস্তিত্বের এই বিচিত্র অবস্থা ও সমতলে-অতলে ওঠা-নামা মহত্তম অভিজ্ঞতার চরিত্রসম্পন্ন।"[১]

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে সুপ্রচুর। বাংলাদেশে এমন একজন ঔপন্যাসিক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি মুক্তিযুদ্ধের বহুবর্ণিল ঘটনাপুঞ্জ, অভিজ্ঞতা ও আলোড়ন-বিলোড়ন নিয়ে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হননি। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ উপন্যাসেই লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান এবং জীবনবোধের রাসায়নিক সংশ্লেষের পরিচয় দুর্লক্ষ্য। এই উপন্যাসসমূহে মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিশিখার তেমন প্রজ্জ্বলন নেই এবং সর্বোপরি ঔপন্যাসিকের সনিষ্ঠা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষরও অনুপস্থিত। তবে কোনো কোনো স্বকালঋদ্ধ, অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান পরিস্নাত এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সংবেদনশীল ঔপন্যাসিকের সদর্থক জীবনচেতনা ও সমাজ অবলোকনশক্তির গভীরতা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু সংখ্যক উপন্যাসকে অনবদ্য ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত শিল্পকর্মে পরিণত করেছে; এবং এঁদের মধ্যে যাঁর নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রাতিস্বিকতায় প্রোজ্জ্বল যাঁর উপন্যাসভুবন- তিনি হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)।

হুমায়ূন আহমেদের 'শ্যামল ছায়া' (১৯৭৩), 'নির্বাসন' (১৯৭৪), 'সৌরভ' (১৯৮৪), 'সূর্যের দিন' (১৯৮৫), 'আগুনের পরশমণি' (১৯৮৫), '১৯৭১' (১৯৮৬), 'অনিল বাগচীর একদিন' (১৯৯২), 'জোছনা ও জননীর গল্প' (২০০৪) প্রভৃতি উপন্যাসে বিষয় ও ভাবের দিক থেকে যেমন বাংলাদেশের রক্তকরোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি এই উপন্যাসপুঞ্জে তাঁর ব্যবহৃত ভাষা এবং উপস্থাপনরীতিতেও বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক অনুষঙ্গের জ্যোতির্ময় প্রয়োগ লক্ষণীয়। স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন বাঙালি জাতিসত্তার সর্বপ্লাবী মর্মযাতনা, হাহাকার, হার্দিক রক্তক্ষরণ,

অবরুদ্ধ সময়ের যন্ত্রণাদগ্ধ অনিশ্চিত ভবিতব্য এবং ভয় ও আতঙ্কের চিত্র যেমন তিনি এঁকেছেন অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুণ্যে, তেমনি সমূলে তুলে এনেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম বীরত্বগাথা, আশ্চর্য দুঃসাহস ও নিখাদ দেশপ্রেম এবং পাকিস্তানি হানাদারদস্যু ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামসদের পৈশাচিক বর্বরতা, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, নারকীয় উল্লাস আর তাদের নিষ্ঠুরতার বহুবর্ণিল প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় হুমায়ূন আহমেদের উপর্যুক্ত উপন্যাসমালা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সত্যস্বরূপকে ধারণ করেই হয়ে উঠেছে হীরকখণ্ডের ন্যায় দ্যুতিময়, ব্যঞ্জনাদীপ্ত এবং শিল্পসফল।

দুই

হুমায়ূন আহমেদের 'শ্যামল ছায়া' উপন্যাসের পটভূমি খুব বিস্তৃত নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় কয়েকজন তরুণ গেরিলা যোদ্ধার একটি অপারেশনের কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে এ-উপন্যাসের জৈবদেহ। জাফর, হুমায়ূন, মজিদ, আনিস প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে যুদ্ধকালীন দুর্গত বাংলাদেশের খণ্ড খণ্ড চিত্র; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকথন যে অভিজ্ঞতালোক উন্মোচন করে আমাদের সামনে, সেখানে বহির্বাস্তবতার ফ্রেমটি অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তবে 'শ্যামল ছায়া'-য় ঔপন্যাসিকের অসামান্য স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, তিনি এ-উপন্যাসে কেরামত মওলা ও হাসান আলীর মতো পাকহানাদার বাহিনীর পদলেহী এমন কিছু রাজাকার-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যারা শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করবার জন্যই রাজাকারে নাম লেখায় নি, অভাবের তাড়নায় অথবা প্রতাপশালী কোনো ব্যক্তির প্ররোচনায় পা ফেলতে বাধ্য হয়েছে ঐ পঙ্কিল পথে। এ-প্রসঙ্গে রাজাকার হাসান আলীর আত্মসমর্থনমূলক ভাষ্য –

> ''চেয়ারম্যান সাব কইলেন, হাসান আলী রাজাকার হইয়া পড়। সত্তর টাকা মাস মাইনা, তার সাথে খোরাকি আর কাপড়। চেয়ারম্যান আমার বাপের চেয়ে বেশি নেকবক্ত পরহেজগার লোক। তার ঘরের খাইয়া এতবড় হইলাম। আমার চামড়া দিয়া চেয়ারম্যান সাবের জুতা বানাইলেও ঋণ শোধ হয় না। তার কথা ফেলতে পারি না। রাজাকার হইলাম।''[২]

দেশদ্রোহী এই সব রাজাকাররা আবার কখনো কখনো তাদের ঘৃণ্যকৃতকর্মের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, কখনো-বা অনুশোচনায় হয়েছে যন্ত্রণাদগ্ধ। পরিণামে বাংলা মায়ের স্বর্ণসন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের মতো তারাও দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তি-সৈনিকের ভূমিকায় অংশ নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি –

> ''গুলি চালাইতে শিখলাম, মিলিটারিরা যত্ন কইরা সব শিখাইল। তারা সবসময় কইত 'তুম সাচ্চা পাকিস্তানি, মুক্তিবাহিনী একদম সাফা কর দো।' মনডার মধ্যে শান্তি পাইনা, বুকটা কান্দে। রাইতে ঘুম হয় না। আমরার সাথে আছিল রাধানগরের কেরামত মওলা। সে আছিল রাজাকার কমান্ডার। ...যখনই হিন্দুর ঘরে আগুন দেওয়া শুরু হইল কেরামত ভাই কইলেন, 'এইটা কী কাণ্ড! কোনো দোষ নাই, কিচ্ছু নাই, ঘরে কেন আগুন দিমু?'...কেরামত ভাইয়ের সাহসের সীমা নাই। বুক ফুলাইয়া কইল, 'আগুন নেই দেঙ্গা।' তার লাশ নদীতে ভাইস্যা উঠল। ...মিলিটারিরা যা করে, তাই করি। নিজের হাতে আগুন লাগাইলাম সতীশ পালের বাড়ি, কানু চক্রবর্তীর বাড়ি...ইস্, মনে উঠলেই কইলজাডা পুড়ায়। শেষমেষ মিলিটারিরা শরাফত সাবের বড় পুলাডারে ধইরা আনল। আমার মাথায় গণ্ডগোল হইয়া গেছে। কী করতাম ভাইব্যা পাই না। শেষকালে ছেলেডা আমার দিকে চাইয়া কইল, 'হাসান বাই, আমারে বাঁচান।' ক্যাপ্টেন সাবের পাও জড়াইয়া ধরলাম। লাভ হইল না। আহারে ভাইরে আমার! কইলজাডা পুড়ায়। ...সেই রাইতেই গেলাম মসজিদে। পাক কোরআন হাতে লইয়া কিরা কাটলাম এর শোধ তুলবাম। এর শোধ না তুললে আমার নাম হাসান আলী না। এর শোধ না তুললে আমি বাপের পুলা না। এর শোধ না তুললে আমি বেজন্মা কুত্তা।''[৩]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী একজন শত্রুর এই আত্মপোলব্ধি, আত্মখনন, আত্মদহন ও আত্ম-উজ্জীবন 'শ্যামল ছায়া' উপন্যাসের সফলতম প্রান্ত, সন্দেহ নেই। মানবিকতাবোধ থেকেই এ-উপন্যাসের চরিত্র-পাত্ররা হয়ে উঠেছে অসীম সাহসী ও বিদ্রোহী। কোনো রাজনৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে এসব চরিত্রকে পরিমাপ করা যাবে না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে দুর্বিষহ অত্যাচার, অবিচার, নারকীয় গণহত্যা, নারী-নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছে এ-ভূখণ্ডের সর্বস্তরের মানুষ, তাতে স্বভাবতই প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে তারা; স্বাধীনতার অবিনাশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে

প্রতিরোধও গড়ে তুলেছে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকদের বহুমুখী বর্বরতার বিরুদ্ধে। হুমায়ূন আহমেদের সাধারণ চরিত্রগুলোর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিদ্রোহীসত্তায় রূপান্তরিত হয়ে উঠবার পেছনে যে মানবিকতাবোধ কাজ করেছে এবং ঔপনিবেশিক শাসক-সৃষ্ট বৈষম্য তাদের মানসলোকে যে প্রোজ্জ্বল মুক্তিচেতনার জন্ম দিয়েছে, তার সাক্ষ্য মেলে 'শ্যামল ছায়া' উপন্যাসে একজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মজৈবনিক সংরক্ত অভিজ্ঞতায় –

> "যে জান্তব পশুশক্তির ভয়ে পরী ছোট ছোট পা ফেলে ত্রিশ মাইল হেঁটে গেছে, আমার সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি তার বিরুদ্ধে। আমি রাজনীতি বুঝিনা। স্বাধীনতা-টাধীনতা নিয়ে সে রকম মাথাও ঘামাই না। শুধু বুঝি - ওদের শিক্ষা দিতে হবে।"[৪]

স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত বাংলার সূর্যসন্তান মুক্তিসেনাদের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধকালীন বৈরি প্রতিবেশে পাকিস্তানি শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় শত্রু রাজাকার-আলবদর-আলশামসদের আত্ম-জাগরণ, আত্ম-উজ্জীবন ও সদর্থক জীবনচেতনায় ক্রম-উত্তরণের নবমাত্রিক উপস্থাপনা মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গবাহী অপরাপর উপন্যাস থেকে 'শ্যামল ছায়া'-কে স্বাতন্ত্র্য ব্যঞ্জনা দান করেছে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হিংস্র বৈরি নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ব্যক্তি-মানসের বহুমুখী সঙ্কট, বহুভুজ জটিলতা, আতঙ্কিত-ভীত মানবসত্তার নির্জিত বিপন্ন-বিধ্বস্ত জীবন, তাদের শোক-তাপ, দুঃখ-ক্ষোভ ও যন্ত্রণা এবং পরিণামে বাঙালি জাতিসত্তার এক প্রোজ্জ্বল, দীপ্তিময় ইতিবাচক জীবনচেতনায় ক্রম-উত্তরণ হুমায়ূন আহমেদের 'নির্বাসন' উপন্যাসের মৌল উপজীব্য। পরিবার বিচ্ছিন্ন এক তরুণীর আত্মজীবন মৌল উপজীব্য হলেও, হুমায়ূন আহমেদের 'সৌরভ' উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত হবার চিত্র। তাঁর 'সূর্যের দিন' উপন্যাসটি কিশোর পাঠকদের জন্য রচিত হলেও এই উপন্যাসের সীমিত পরিসরে বিম্বিত হয়েছে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের অবরুদ্ধ, রক্তাক্ত সময়, নগরবাসী জনজীবনের অস্থিরতা, চাপা আতঙ্ক, পাক-হানাদার বাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যা, বিধ্বস্ত শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে অবিরাম ছুটে চলা জনস্রোত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই অগ্নিময় ঐতিহাসিক ভাষণ ইত্যাদি বহুবর্ণময় প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। 'সূর্যের দিন' উপন্যাসের কতিপয় উজ্জ্বল এলাকা –

> *ক.* "সাত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেবেন রেসকোর্সের মাঠে। ভোর রাত থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। দোকান-পাট বন্ধ। অফিস-আদালত নেই। সবার দারুণ উৎকণ্ঠা। কি বলবেন এই মানুষটি? সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।...অবশেষে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলে উঠল বাংলাদেশ।"[৫]
>
> *খ.* "শুরু হল একটি অন্ধকারময় দীর্ঘ রাত। মানুষের সঙ্গে পশুদের একটা পার্থক্য আছে। পশুরা কখনো মানুষের মতো হৃদয়হীন হতে পারে না। পঁচিশে মার্চের রাতে হৃদয়হীন একদল পাকিস্তানি মিলিটারি এ শহর দখল করে নিল। তারা উড়িয়ে দিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন। জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলের প্রতিটি ছাত্রকে গুলি করে মারল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকে হত্যা করল শিক্ষকদের। বস্তিতে শুয়ে থাকা অসহায় মানুষদের গুলি করে মেরে ফেলল বিনা দ্বিধায়। এক রাত্রিতে এ শহর মৃতের শহর হয়ে গেল। ...সাতাশ তারিখ চার ঘণ্টার জন্য কার্ফু তোলা হলো। মানুষের ঢল নামল রাস্তায়। বেশির ভাগই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। করুণ অবস্থা।"[৬]

তবে যে ব্যাপক, গভীর ও সমগ্রতাস্পর্শী জীবন-অনুধ্যান উপন্যাস-নির্মিতির মৌল শর্ত, মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গবাহী উপর্যুক্ত তিনটি উপন্যাস- 'নির্বাসন', 'সৌরভ' ও সূর্যের দিন'-এ হুমায়ূন আহমেদ যেন সে শর্ত পূরণে অনেকটাই দ্বিধান্বিত। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময় ও সমাজবাস্তবতার সত্যস্বরূপ উন্মোচনের প্রশ্নে তাঁর '১৯৭১' উপন্যাসটি তুলনামূলক ভাবে সফল শিল্পকর্ম। অনেকটা সরলথোয় উপস্থাপিত এই উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণে আমরা দেখি- সহসাই একদিন, মুক্তিযুদ্ধের সময়, শেষরাত্রিতে প্রচুর পাকিস্তানি সৈন্য এসে অবস্থান নেয় সুখী-শ্যামল-ছায়াসুনিবিড়-শান্তির নীড় নীলগঞ্জ গ্রামের একমাত্র স্কুল ঘরটিতে। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস- এই গ্রামের গভীর-গহীন জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি সৈন্য এবং অফিসার। তাঁদের খোঁজ জানতে পাকিস্তানি মেজর এজাজ নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন চালায় স্থানীয় মসজিদের ইমাম এবং স্কুল-শিক্ষক আজিজের ওপর। রফিক নামক এক রাজাকারের

সহায়তায় পাকিস্তানি মেজর তিনজন নিরীহ গ্রামবাসীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, তার সহযোগী সৈন্যরা এক বাড়িতে গিয়ে নারী-ধর্ষণও করে আসে। জঙ্গলে আত্মগোপনকারী বাঙালি সৈন্যদের সবার অলক্ষ্যে খাদ্য যোগাচ্ছে কৈবর্তরা- এই অজুহাতে কৈবর্ত পাড়ার প্রতিটি ঘর আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয় পাক-মেজর। নারী দেহলোভী পাকিস্তানি সৈন্যদের স্থূলতা ও বিকারগ্রস্ততা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়, তার সত্য-স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। লিবিডো-তাড়িত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বহুস্তরময় যৌনকামনা এবং তাদের অবচেতনলোকে ক্রিয়াশীল যৌনতাড়নার সর্বগ্রাসী বুভুক্ষায় শিহরিত নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ঔপন্যাসিক তুলে আনেন মুক্তিযুদ্ধক্ষত তীক্ষ্ণমুখ অভিজ্ঞতায় –

> "মেজর সাহেব কৌতূহলী হয়ে তাকালেন। তাঁর চোখ দু'টি খুশি খুশি।
> 'বল, মেয়েটির বয়স কত?'
> 'বয়স কম।'
> 'কত?'
> 'তের-চৌদ্দ।'
> 'তের-চৌদ্দ বছরের মেয়েই তো ভালো। যত কম বয়স তত মজা।'
> আজিজ মাস্টার স্তম্ভিত হয়ে গেল। কি বলছে এসব?
> 'মেয়েটির সঙ্গে তোমার যৌন সম্পর্ক আছে?'
> 'না।'
> 'মাথা নিচু করে আছ কেন? মাথা তোল।'
> আজিজ মাস্টার মাথা তুলল।
> 'মেয়েটির বুক কেমন আমাকে বল। আমি শুনেছি বাঙালি মেয়েদের বুক খুব সুন্দর, কথাটা কি ঠিক?'
> ...আজিজ মাস্টারের কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। বমি বমি ভাব হলো।"[৭]

নিরীহ বাঙালি নর-নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার-নিপীড়ন-নির্যাতন চালাবার সময় বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের মনুষ্যত্ববর্জিত বিবেক যে কতটা পশুত্বের স্তরে নেমে গিয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত চিত্রাংশে –

> "মেজর সাহেব কফির মগ নামিয়ে রাখলেন। সিগারেট ধরালেন।
> '...মসজিদে লোক হয়?'
> 'হয় স্যার।'
> 'সেখানে তুমি কি পাকিস্তানের জন্যে দোয়া কর?'
> 'জ্বি না স্যার।'
> 'বাংলাদেশের জন্যে দোয়া করেছ?'
> ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। মেজর সাহেব হঠাৎ প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গেলেন। ...তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল। মেজর সাহেব এগিয়ে এসে তাকালেন আজিজ মাস্টারের দিকে।
> '...রফিক, তুমি ওর জামা কাপড় খুলে ওকে নেংটা করে ফেল। ...এই মিথ্যাবাদী কুকুরটাকে নেংটা করে সমস্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখাবে। বুঝতে পারছ? ...আর শোন, একটা ইটের টুকরো ওর পুরুষাঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে। এতে সমস্ত ব্যাপারটায় একটা হিউমার আসবে।"[৮]

নির্বিরোধী অসহায় নরনারীর ওপর পাকসেনাদের এই পৈশাচিক বর্বরতা দেখে পাকিস্তানি দালাল রফিকের চৈতন্যোদয় ঘটে একসময়, নীরবে-নিঃশব্দে। তার অন্তর্ভুবন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়, ক্ষোভে, হার্দিক রক্তক্ষরণে রক্তাক্ত হতে থাকে। তার হৃদয়ে সুপ্ত দেশপ্রেম, বাঙালির চিরকালীন ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত হয় এবং তার মনে পাকিস্তানি পামরদের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদীচেতনা জ্বলে ওঠে। পরিণামে, তাকেও জীবন দিতে হয় মেজর এজাজের সৈন্যদের হাতে। উপন্যাসের পরিণামী দৃশ্য যেমন তাৎপর্যবহ, তেমনি সঙ্কেতময় –

> "মেজর এজাজ আহমেদ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে ডানদিকে, চাইনিজ রাইফেল হাতে দু'জন জোয়ান এসে দাঁড়িয়েছে। রফিক নেমেছে বিলে। ...কৈবর্ত পাড়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আলো হয়ে উঠছে চারদিক। রফিককে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার। ছোটখাটো অসহায় একটা মানুষ।
> বুক পানিতে দাঁড়িয়ে আছে রফিক। মেজর সাহেব বললেন, 'রফিক তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও?'
> রফিক শান্তস্বরে বলল, 'চাই মেজর সাহেব। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। আপনি নিজেও চান, চান না?'
> মেজর সাহেব চুপ করে রইলেন। রফিক তীক্ষ্ণস্বরে বললো, 'আমার কিন্তু মনে হয় না আপনি জীবিত ফিরে যাবেন এ দেশ থেকে।'...
> বুক পর্যন্ত পানিতে পা ডুবিয়ে লালচে আগুনের আঁচে যে রফিক দাঁড়িয়ে আছে, মেজর এজাজ আহমেদ তাকে চিনতে পারলেন না। এ অন্য রফিক। মেজর এজাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।"[৯]

'মেজর সাহেব, আমার কিন্তু মনে হয় না আপনি জীবিত ফিরে যাবেন এ দেশ থেকে'- রাজাকার রফিকের এই স্পর্ধিত উচ্চারণ বাঙালির সাহস, সংগ্রাম, গণমানুষের প্রতিবাদ আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার উজ্জ্বল সম্ভাবনাকেই মূলত প্রতীকায়িত করে তোলে; ব্যঞ্জনাদীপ্ত করে তোলে বাঙালির দুর্জয় সাহস আর হাজার বছরের সংগ্রামী জীবনের ইতিবৃত্তকে। '১৯৭১' উপন্যাসে মানব-অস্তিত্বের এই উজ্জীবনসূত্রসন্ধান, সন্দেহ নেই, ঔপন্যাসিকের ইতিবাচক জীবনার্থের গৌরবময় প্রান্ত।

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিচেতনার লূতাতন্তুজালে বন্দি পাকিস্তানি শাসকের লেলিয়ে দেয়া হিংস্র-বর্বর বাহিনী ১৯৭১ সালে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যে অকথ্য নির্যাতন ও নৃশংস উৎপীড়ন চালায়- হুমায়ূন আহমেদের 'অনিল বাগচীর একদিন' উপন্যাসটি তার সার্থক শিল্পভাষ্য। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামকে ভিন্নতর খাতে প্রবাহিত করবার অভিসন্ধিতে পাকিস্তানি হানাদাররা সুপরিকল্পিত ভাবে এ-ভূখণ্ডের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্বিচারে হত্যা করেছে; কখনো তারা নিজেরা, আবার কখনো-বা তাদের এদেশীয় মিত্র রাজাকাররা হিন্দুদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হয় ধ্বংস করেছে, না হয় নির্দ্বিধায় হস্তগত করেছে। যেকোনো বয়সী হিন্দু নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে তারা তাদের যৌনকামনা চরিতার্থ করেছে; হয়তো সেই নারীদের কেউ কেউ ধর্ষিতা হয়ে ফিরে এসেছে, কেউ কেউ কোনো দিনই আর ফেরেনি। এই রক্তাক্ত ঐতিহাসিক সত্যতা প্রত্যেক বাঙালিরই অবশ্যস্বীকার্য। আমরা জানি, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ববাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর চলতে থাকে পাক-শাসকের সীমাহীন অত্যাচার-নিপীড়ন-নির্যাতন। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলে পাকিস্তানিরা বজ্রাহত হয়ে পড়ে। ফলে, ১৯৭১-এ পাক-মিলিটারির বন্দুকের প্রথম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী আর হিন্দু জনগোষ্ঠী। তাদের সৃষ্ট এদেশীয় দালালশ্রেণি অর্থাৎ কনভেনশন মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামের সমর্থক রাজাকার-আলবদর-আলশামসরা হিন্দু-নির্যাতনে ও তাদের যাবতীয় সম্পত্তি লুট করতে সমধিক তৎপর হয়ে ওঠে। তবে স্বাধীনতাকামী বৃহৎ মুসলিম বাঙালি জনগোষ্ঠী ছিলো সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিকভাবেই সহানুভূতিশীল। হুমায়ূন আহমেদের 'অনিল বাগচীর একদিন' উপন্যাসটি এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার একটি মুহূর্তের একটি বাস্তব ক্যামেরা-ছবি।

উপন্যাসের নায়ক অনিল বাগচী একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের সন্তান। পিতার আদর্শ ও প্রচেষ্টা অনিলকে একজন সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। এই উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা যেদিন রাত থেকে, ঐ সময়ে রাতে ঢাকা নগরীর প্রায় কারোরই ঘুম হতো না। অনিলও ঘুমাতে পারেনি; ঘুমাতে পারেনি তার পাশের কামরার গফুর সাহেবও। এই গফুর সাহেবের যন্ত্রণা আবার দুই দিক থেকে- একদিকে পিশাচরূপী পাকিস্তানি মিলিটারিদের অতর্কিতে হানা দেবার ভয়, অন্যদিকে অনিলের নির্বিরোধী পিতা যে হানাদারদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন, এই সংবাদটা অনিলকে জানাতে না পারার দুঃসহ যাতনা। অবশেষে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে পাষাণে বুক বেঁধে তিনি অনিলকে চরম দুঃসংবাদটা জানাতে সক্ষম হন এবং অনিলের পিতার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের লেখা চিঠিটা তাকে দেন। সেদিনই পড়ন্ত বিকেলে গ্রামের বাড়ি যাত্রাকালে অনিল হিন্দু হবার অপরাধে পাক-মিলিটারি এবং তাদের পরম মিত্র রাজাকারদের হাতে

ধৃত হয়। একই বাসের সহযাত্রী আয়ুব আলী শত চেষ্টা করেও স্বল্পপরিচিত অনিলকে তথাকথিত মহসিন সাহেবের ছদ্ম-পরিচয়েও বাঁচাতে পারেন না তাদের হিংস্র নখর থেকে –

> "অনিল এবং আয়ুব আলী লাইনের শেষ মাথায়।
> সুবেদার সাহেব অনিলের পাশে এসে দাঁড়ালো।
> বাঙালি দোভাষীর চা খাওয়া শেষ হয়েছে। সে এসে সুবেদারের কাছে দাঁড়ালো।
> 'কি নাম?'
> 'অনিল। অনিল বাগচী।'
> হতভম্ব আয়ুব আলী বললেন, 'ঠিক নাম বলেন। ঠিক নামটা স্যারকে বলেন। স্যার ইনার আসল নাম মোহাম্মদ মহসিন। বাপ-মা আদর করে অনিল ডাকে।'
> 'তোমার নাম মোহাম্মদ মহসিন?'
> অনিল চুপ করে রইল। আয়ুব আলী হড়বড় করে বললেন, 'আমার খুবই পরিচিত স্যার। দূর সম্পর্কের রিলেটিভ হয়। খাঁটি মুসলমান।' বাঙালি দোভাষী বলল, 'অনিল হইল হিন্দু নাম।' আয়ুব আলী হাসিমুখে বললেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য এটা হয়েছে ভাই সাহেব। বাপ-মা আদর করে ছেলেমেয়েদের বাংলা নাম রাখে। যেমন ধরেন- সাগর, পলাশ। ছেলেপুলের তো দোষ নাই, বাপ-মায়ের দোষ।'
> ...ক্যাপ্টেনের চোখে-মুখে খানিকটা উৎসাহ ফিরে এসেছে। সে অনিলের কাছে উঠে এলো। ইংরেজিতে বলল, 'তুমি হিন্দু?'
> অনিল বলল, 'ইয়েস স্যার।'
> 'তুমি মুক্তিবাহিনীর লোক? ...মুজিবের পা-চাটা কুকুর? মুজিবের পা কখনো চেটে দেখেছ? কেমন লাগে পা চাটতে?
> অনিল চুপ করে রইল। ক্যাপ্টেন বলল, 'একে ঘরে নিয়ে যাও।'
> আয়ুব আলী ব্যাকুল গলায় বললেন, 'স্যার, আমার একটা কথা শুনেন স্যার। যে কেউ একবার কলেমা পড়লেও মুসলমান হয়ে যায়। এটা হাদিসের কথা। মহসিন কলেমা জানে। তারে জিজ্ঞেস করেন। সে বলবে।'
> ...ক্যাপ্টেন আয়ুব আলীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।' আয়ুব আলী বললেন, 'স্যার, মহসিন সাহেবকে নিয়ে যাই?'
> 'ও থাকুক। তোমাকে উঠতে বলেছি, তুমি ওঠ।'
> আয়ুব আলী ব্যথিত চোখে অনিলের দিকে তাকালেন।"[১০]

মৃত্যুর গহ্বরের দিকে যাবার আগে অনিল স্বল্প-সময়ের পরিচিত আয়ুব আলীকে যখন বলে,

> "আমার বড় বোন আছে রূপেশ্বর হাই স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে' তখন 'আয়ুব আলী অনিলের কথা শেষ করতে দিলেন না। ছেলে মানুষের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বলতেছি, মাটির কসম খেয়ে বলতেছি আপনার যদি কিছু হয়, আমি আপনার বোনকে দেখব, যতদিন বাঁচব দেখব। বিশ্বাস করেন আমার কথা। বিশ্বাস করেন।"[১১]

আয়ুব আলীর এই অসাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃস্নেহ, প্রগাঢ় মমতা আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসার তীব্রতা আমাদের মানসচৈতন্যকে দ্রবীভূত করে, আমাদের হৃদয়ে গভীরতর করে তোলে বেদনার নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ। আয়ুব আলীর মতো এমন নিঃস্বার্থ মানুষ সত্যি সেদিন বাংলার প্রতিটি ঘরে-ঘরে, পথে-পথে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরেই ছিলো। তারা অনিলদেরকে রক্ষা করতে পারেনি হয়তো-বা অনেক সময়ই, কিন্তু অনিলদের মতো অনেককেই আশ্রয় দিয়েছে নিজ গৃহে, হানাদারদের রক্তচক্ষু আর শত্রুপক্ষের উদ্যত-সঙ্গীন উপেক্ষা করে। সমাজজীবনের এই অন্তঃশীলা প্রাণাবেগকে সচেতন রাজনৈতিক ও মানবিক অভিজ্ঞান থেকে অবলোকন করেছেন ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। আর তাই সঙ্গতকারণেই তাঁর এই 'অনিল বাগচীর একদিন' উপন্যাসে জীবনোপলব্ধির নবমাত্রা প্রতিবাদের প্রতীক-সত্যে উপনীত হয়েছে।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে ক'টি উল্লেখযোগ্য ও প্রাতিস্বিকতাচিহ্নিত উপন্যাস রচিত হয়েছে, হুমায়ূন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি' সেগুলোর অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধের

ত্যাগ ও শৌর্যকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে এই মেদহীন উপন্যাসটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে ক'টি চরিত্রের সমাবেশে সম্পূর্ণতা পেয়েছে এ-উপন্যাসের আয়তন ও ঘটনা-উপঘটনামালা, অনায়াসেই তাদেরকে দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়- এর একভাগে রয়েছে অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর অসহায় নরনারী, যারা ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়নি কিংবা যেতে পারেনি। যেমন- মতিন সাহেব, সুরমা, রাত্রি, অপালা, শরীফ সাহেব, নাসিমা, ইয়াদ সাহেব, আশফাক, ফারুক চৌধুরী। শিশু-সুলভ সারল্য, সততা ও স্বদেশপ্রেমের ঔজ্জ্বল্যে এই চরিত্রগুলি ঝলমলে। অপরভাগে রয়েছে বদিউল আলম, সাদেক, নুরু, রহমান, নাজমুল ও গৌরাঙ্গ- ভারত থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা সদ্য ঢাকা শহরে প্রবেশ করেছে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করবার দৃঢ় প্রত্যয় আর অগ্নিশপথ বুকে ধারণ করে। এই দুর্নমিত মুক্তিযোদ্ধারা উপন্যাসের আখ্যানকে স্পন্দনশীল করেছে এবং এদের আত্মত্যাগ ও শৌর্যের বীরত্বগাথা মৃত্যুহীন মহিমা নিয়ে এ-উপন্যাসে হয়ে উঠেছে ভাস্বর। স্বাধীনতার অমর আলেখ্যকে প্রাণময় করে তুলবার জন্যে যে ধরনের অনুভূতিশীল এবং তেজোদীপ্ত চরিত্রসৃষ্টি করা প্রয়োজন, অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গেই ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ তা সৃষ্টি করেছেন। ফলে, সব ক'টি চরিত্রই 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসে হয়ে উঠেছে জীবন্ত এবং প্রাণাবেগে ভরপুর, গতিচঞ্চল।

একাত্তরের অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর অজস্র দিশেহারা ও অসহায় পরিবারের মতোই একটি পরিবার হলো মতিন সাহেবের পরিবার। স্ত্রী সুরমা, কন্যা রাত্রি ও অপালা এবং কাজের মেয়ে বিন্তিকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। অফিসের কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই মতিন সাহেব তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ও সম্ভাবনা নিয়ে মেতে ওঠেন। তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে শুনে শুনে তিনিও মুক্তিযোদ্ধাদের 'আজদহা' নামে অভিহিত করেন। 'আজদহা' শব্দটির সঠিক অর্থ তিনি জানেন না; তবে এই শব্দের মধ্যে যে একটা বীরত্বব্যঞ্জক ও বেপরোয়া ভাব আছে, তা তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অত্যন্ত পছন্দ করেন। কোনো বেতার-তরঙ্গ থেকে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির সামান্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলেই তিনি হয়ে ওঠেন উৎসাহিত ও আশান্বিত। তবে মতিন সাহেব শুধু নিরাপদ অবস্থানে বসেই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন না, তার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতেও সমধিক আগ্রহী। আর এই আগ্রহের সূত্র ধরেই তাঁর বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয় মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম। দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা বদিউলের রক্তে যেমন নাচন তোলে, তেমনি মতিন সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী-কন্যার হৃদয়েও সঞ্চারী সুর হয়ে তা অনুক্ষণ বাজতে থাকে। স্বল্পবাক, স্থিরপ্রত্যয়ী ও অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার মানুষ মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম পঁচিশ মার্চের কালরাত্রিতে সেনা আগ্রাসনের পর ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। ভারত থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে তিন মাস পর, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঁচজন যুদ্ধসঙ্গীসহ সে ফিরে আসে তার এই প্রিয় ঢাকা শহরটিতে । নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার প্রয়োজনেই বদিউল আলম আশ্রয় নেয় সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অনাত্মীয় মতিন সাহেবের বাসায়। তিনমাস পর অবরুদ্ধ ঢাকায় ফিরেই বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করে সে। মতিন সাহেবের সঙ্গে আলাপচারিতায় সে সহজেই বুঝে নেয় ''গুজবে ভেঙে পড়েছে ঢাকা শহর। মানুষের মরাল ভেঙে পড়েছে''[১২]। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলম তার গেরিলা ইউনিটের কর্তব্য-কর্মটি ঠিক করে ফেলে। সে সিদ্ধান্ত নেয় –

> ''ঢাকা শহরে গেরিলাদের প্রথম কাজ হবে এই মরাল ঠিক করা। নতুন ধরনের গুজবের জন্ম দেয়া। যা শুনে একেক জনের বুকের ছাতি ফুলে উঠবে। এরা রাতে আশা নিয়ে ঘুমুতে যাবে[১৩]।''

ঢাকাবাসীর এই আশাপূর্ণ নিদ্রাকে নিশ্চিত করতেই বদিউল আলম ও তার গেরিলা যোদ্ধারা পর পর কয়েকটি সফল দুর্ধর্ষ অভিযান পরিচালনা করে। তাদের অকুতোভয় ও অমলিন শুভ্র আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই ভালোবেসেছে মতিন সাহেবের মতো ঢাকা শহরের প্রায় প্রতিটি বাঙালি পরিবার। দোকানদার ইদ্রিস মিয়া তাই নিজে উদ্যোগী হয়ে বদিউলকে মতিন সাহেবের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছে। ডাক্তার ফারুক চৌধুরী তাদের গেরিলা অপারেশন পরিচালনার সুবিধার্থে হাসিমুখে আলমদের হাতে শুধু তাঁর গাড়ির চাবিই তুলে দেন নি, তেল কেনার টাকা দেবার জন্যেও উদগ্রীব হয়েছেন। পাক-সরকারের উচ্চ-পদস্থ চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও শরীফ সাহেব বিপদের সমূহ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে গেরিলাদের সবরকম সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আর এইসব বর্ধিত সাহায্য ও সহানুভূতির দৃশ্য পরম্পরাকে চিত্রিত করে ঔপন্যাসিক এই সত্যটিকেই সুস্পষ্ট করে তোলেন যে, একাত্তরের যুদ্ধ ছিলো গোটা বাঙালি জাতির যুদ্ধ এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে

প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমগ্র বাঙালি জাতিই এতে অংশগ্রহণ করেছিলো। পরিণামে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তার নিজস্ব তেজ ও দীপ্তিতে বলীয়ান হয়ে হীরকখণ্ডের ন্যায় প্রজ্বোল হয়ে উঠতে থাকে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য এবং সকল ভয়কে আগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসে বদিউল আলম, সাদেক, নুরু, রহমান, গৌরাঙ্গ ও আশফাকের মতো মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণেরা- প্রিয় দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকে যারা জেনেছে আপন জীবনের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। তাই দুর্ধর্ষ পাকিস্তানি মিলিটারির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তারা সামান্য ক'টি অস্ত্র সম্বল করে। দুর্বিনীত মিলিটারি বাহিনীকে তারা মুহূর্তের মধ্যে পরাজিত করেছে, বীরবিক্রমে আক্রমণ চালিয়েছে ফার্মগেটের দুর্ভেদ্য মিলিটারি আস্তানায়। তাদের এই অর্বাচীন সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছে পাকিস্তানি সুবেদার মেজর মাসুদ খাঁ স্বয়ং। কিন্তু সেই মুগ্ধতা তাকে ইউনিটসুদ্ধ নিয়ে গেছে মৃত্যুর পরপারে; যুগপৎ গ্রেনেড ও গুলির আঘাতে একের পর এক বিধ্বস্ত হয়েছে পাক-বাহিনীর ঘাঁটি, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠেছে অর্ধেক ঢাকা শহর। সেই শব্দের আতঙ্ক ও উল্লাসকে পেছনে ফেলে তারা দ্রুতগতিতে এগিয়েছে হোটেল ইন্টারকনের দিকে, যেখানে তখন অবস্থান করছে বিদেশি সাংবাদিকরা। সেখানেও তারা সাফল্যের সঙ্গে ছড়িয়েছে শব্দের সাহসী সন্ত্রাস, এবং নিরাপদেই ফিরে গেছে আপন আপন আস্তানায়। তাদের এই আকস্মিক ও বেপরোয়া অপারেশনে নতুনভাবে প্রাণ ফিরে পেয়েছে মৃতপ্রায় ঢাকা নগরী। দোর্দণ্ড পাকিস্তানি দাপটকে যারা ভেবেছিলো অমোচনীয় নিয়তি এবং নিজেদেরকে ভেবেছিলো শৃঙ্খলিত অসহায়- আত্মবিশ্বাসের এক নতুন বাতায়ন খুঁজে পায় তারা। আর অবরুদ্ধ, শৃঙ্খলিত জনগণের মনে আশার এই আলোটুকু জ্বালাতে গিয়েই মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম এবং তার সহযোদ্ধাদেরকে বিলিয়ে দিতে হয়েছে প্রাণ; দিতে হয়েছে আত্মাহুতি; অকাল-বিনাশের এ এক মর্মন্তুদ, করুণ ও রক্তাক্ত চিত্র।

পর পর কয়েকদিনের আশাতীত সাফল্যের পরবর্তী দিনে বদিউল আলমেরা বের হয় নতুন অপারেশনে। কিন্তু যত সহজে তারা সাফল্যের স্বপ্ন দেখেছিলো, তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া মূল্যে তাদেরকে অর্জন করতে হয় সেই সাফল্য। হানাদার বাহিনীর বুলেট বিদীর্ণ করে ফেলে স্থিরপ্রত্যয়ী গেরিলা বদিউল আলমের বুক। নিহত হয় মুক্তিযোদ্ধা নুরু ও সাদেক। শত্রুসেনার হাতে ধরা পড়ে প্রাণাবেগে উদ্দীপ্ত অসমসাহসী যুবক আশফাক। তাদের এই আপাত-পরাজয় পাক-বাহিনীর প্রতাপকে যেমন একদিকে মুখ্য করে তোলে, অপরদিকে তেমনি আমাদের দৃষ্টি ফেরায় সেই অতুল্য ত্যাগের দিকে- স্বাধীনতার বেদীতে যারা উৎসর্গিত হয়েছে গোটা নয়টি মাস ধরে। যেসব বীরের রক্তস্রোত এবং বাংলা-মায়ের অশ্রুধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে নির্মাণ করেছে বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার পথরেখা, সেই রক্ত আর অশ্রুর আলপনায় 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসের শেষাংশ সিক্ত হয়ে উঠেছে। সঙ্গতকারণেই এই সিক্ততা আমাদের বেদনার অনুভবকে করে তোলে প্রগাঢ়। তবে পরাভব কিংবা হতাশার তিমিরে তা পথ হারায় নি; বরং এক উজ্জ্বল প্রভাতের তাৎপর্যময় ইঙ্গিত দিয়ে শেষ হয়েছে উপন্যাসটি। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন- 'জোনাকি দেখা যাচ্ছে না, কারণ ভোর হচ্ছে। গাছে গাছে পাখ-পাখালি ডানা ঝাপটাচ্ছে। জোনাকিদের এখন আর প্রয়োজন নেই'[১৪]। ঢাকা শহরে যখন ব্যাপ্ত হয়েছিলো পাকিস্তানি হানাদারকর্তৃক সৃষ্ট হতাশার ঘন অন্ধকার, আলম-নুরু-গৌরাঙ্গ-সাদেক-আশফাকের মতো গেরিলাযোদ্ধারাই তখন আশার আলো জ্বালিয়ে তুলেছিলো ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে। হতাশার অন্ধকারে বসবাসকারী মানুষগুলোর নির্জীব সত্তায় প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনবার জন্যে এই জোনাকিসম ক্ষুদ্র-আলোর বড় বেশি প্রয়োজন ছিলো সেই দুঃসময়ে। কিন্তু জোনাকি তো রাতের আঁধার দূর করতে পারে না; তার জন্যে চাই সূর্যের সর্বপ্লাবী আলো। সেই বৃহত্তর আলোর আশু-আবির্ভাবের বার্তা ঘোষণা করে যে ইঙ্গিতধর্মিতায় এ-উপন্যাসের পরিসমাপ্তি, তা আমাদের স্বাধীনতা-সূর্যের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুদয়ের ইশারা বিলিয়ে যায়। তিরিশ লক্ষ শহিদের রক্ত আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে অনন্ত-অক্ষয় বাংলাদেশ, আমাদের গর্বিত জন্মভূমি; আকাশে-বাতাসে অনুরণিত হয় সেই অবিনশ্বর বাণী- 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই' –

> "রাত্রি একা একা বারান্দায় বসে আছে। সে তাকিয়ে আছে নারকেল গাছের দিকে। সেখানে বেশ কিছু জোনাকি ঝিকমিক করছে।...আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একটি দু'টি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। রাত্রি লক্ষ করলো আকাশের তারার সঙ্গে জোনাকিদের চমৎকার মিল আছে। ...সুরমা বারান্দায় এসে তাকালেন মেয়ের

> দিকে। তাঁর বুকে ধ্বক করে একটা ধাক্কা লাগলো। ...সুরমা ক্লান্তস্বরে বললেন, ভোর হতে দেরি নেই। ...দুজনে অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না। রাত্রির চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়তে লাগলো। সুরমা মেয়েকে কাছে টানলেন। চুমু খেলেন তার ভেজা গালে। রাত্রি ফিস ফিস করে বললো, 'জোনাকিগুলিকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন মা?' জোনাকি দেখা যাচ্ছে না, কারণ ভোর হচ্ছে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। গাছে গাছে পাখ-পাখালি ডানা ঝাপটাচ্ছে। জোনাকিদের এখন আর প্রয়োজন নেই।''[১৫]

যে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, তারই কয়েকটি অকুতোভয় ও তেজোময় প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ ছড়িয়ে আছে এই উপন্যাসের পরতে পরতে। আমাদের স্বাধীনতাসূর্যের আলোকপিয়াসী সেই অমৃতের সন্তানেরা এখানে তাদের শৌর্যগাথা ও হৃদয়ানুভবের এক আশ্চর্য উজ্জ্বল আলপনা এঁকে রেখেছে; মুক্তির অগ্নিস্পর্শে দীক্ষিত হয়ে একদিন যারা খাঁটি সোনা হয়ে উঠেছিল, 'আগুনের পরশমণি' বুকে ধারণ করে আছে তাদেরই অমরগাথা।

হুমায়ূন আহমেদের 'জোছনা ও জননীর গল্প' উপন্যাসটি দীর্ঘ পরিকল্পনা, বিপুল পাঠ ও শ্রমনিষ্ঠ সাধনার শিল্পফসল। বিপুলায়তন এই মহাকাব্যিক উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে চিত্রায়িত হয়েছে বাংলাদেশের রক্তকরোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার ও গণহত্যা, নারী-ধর্ষণ, রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীর দালালি, সাধারণ মানুষের দুঃসহ জীবনপ্রবাহ, ভারতের শরণার্থী শিবিরে তাদের আশ্রয়গ্রহণ, পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুঃসহ বন্দিজীবন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ, বুদ্ধিজীবী হত্যা, গেরিলা যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতাকামী সর্বস্তরের জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে একান্ত স্বজনের মতো ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিঃশর্ত সহায়তা ইত্যাদি বহুবর্ণময় ঘটনা-উপঘটনা অত্যন্ত শ্রমনিষ্ঠ পরিচর্যায় এই উপন্যাসে শিল্পরূপ দান করেছেন ঔপন্যাসিক। শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলে বিচরণ করেছে এই উপন্যাসের চরিত্রমালা; কখনো তারা উপনীত হয়েছে আগরতলার শরণার্থী শিবিরে, কখনো পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুর জেলখানায়, আবার কখনো-বা কলকাতার ব্রিগেড গ্রাউন্ড চত্বরে; এবং এভাবেই তারা বারংবার ঘুরে-ফিরে আসে বারাসত পার্ক স্ট্রিট, নীলগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, পিরোজপুর, বানারীপাড়া, স্বরূপকাঠি, চট্টগ্রাম, বরিশালসহ কত বিচিত্র জায়গায়। বহু মানুষের আনাগোনা সংলক্ষ্য এই উপন্যাসে- শাহেদ, ইরতাজউদ্দীন, আসমানী, নাইমুল, মোবারক, কংকন, মরিয়ম, কালিপদ, আসগর, মনোয়ারা, কলিমউল্লাহ, গৌরাঙ্গ, সোবহান, সরফরাজ, ফয়জুর রহমান, মজনু মিয়া, মাসুমা, রুনি, কমলা, ছদরুল আমিন; এবং এইসব সাধারণ মানুষের পাশাপাশি 'জোছনা ও জননীর গল্প' উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে উপস্থিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান, প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কবি শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, চীনের চৌ এন লাই, রাশিয়ার পোদগর্নি, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিক্সন, জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট, মেজর জিয়াউর রহমান, ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম এবং স্বয়ং ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। পূর্বেই বলেছি, 'জোছনা ও জননীর গল্প' উপন্যাসের ভরকেন্দ্রে অবস্থান করেছে বাংলাদেশের মহান গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ; মুক্তিযুদ্ধই পালন করেছে এই উপন্যাসে কেন্দ্রানুগ শক্তির ভূমিকা। ফলে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন অনেক ঘটনা-উপঘটনা এবং প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ একক মোহনায় মিলিত হতে পেরেছে। হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই 'জোছনা ও জননীর গল্প' উপন্যাসের চরিত্রমালার উচ্চারিত ভাষা ও সংলাপও সহজ ও সাবলীল এবং চিত্তাকর্ষক, যা অতি সহজেই পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে পালন করেছে কার্যকর ভূমিকা। এ-উপন্যাস থেকে একটি দীপিত দৃষ্টান্ত –

> ''নীলগঞ্জের অতি শ্রদ্ধেয় অতি সম্মানিত মানুষ মাওলানা ইরতাজউদ্দীনকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় প্রদক্ষিণ করানো হলো। তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হলো নীলগঞ্জ স্কুলে। সেখান থেকে নীলগঞ্জ বাজারে। বাজারে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটল। দরজির দোকানের এক দরজি একটা চাদর নিয়ে ছুটে এসে ইরতাজউদ্দীনকে ঢেকে দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকলো। ইরতাজউদ্দীন এবং দরজিকে মাগরেবের নামাজের পরে সোগাগি নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করা হলো। ...মনসুর সাহেব তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ইরতাজউদ্দীনকে মিলিটারিরা গতকাল সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে গুলি

করে মেরেছে। তারা এ অঞ্চলে কারফিউ দিয়ে রেখেছে। মৃতদেহ পড়ে আছে নদীর পাড়ে। ভয়ে কেউ সেখানে যাচ্ছে না। আমি ওনার ডেডবডি নিয়ে আসতে চাই। নিয়ম মতো কবর দিতে চাই।

আসিয়া বললেন, আপনি একা এই কাজ করতে পারবেন?

-কেন পারবো না? পারতে হবেই।

-আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি যাব আপনার সাথে।

মনসুর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি যেতে চাও?

-জ্বি, যেতে চাই। মিলিটারিরা যদি আপনাকে গুলি করে মারে, তাহলে আপনার সঙ্গে আমিও মরতে চাই। আমি একা বেঁচে থেকে কি করবো?"[১৬]

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে আমাদের প্রায়ই মনে হয়, যে ব্যাপক ও গভীর এবং সমগ্রতাস্পর্শী জীবন-অনুধ্যান উপন্যাস-নির্মিতির মৌল শর্ত, মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গবাহী 'জোছনা ও জননীর গল্প' উপন্যাসটিতে হুমায়ূন আহমেদ যেন সে শর্ত পূরণে অনেকটাই দ্বিধান্বিত। তবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী বিশাল মহাকাব্যিক ক্যানভাসই বস্তুত এই উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য শিল্পসফল প্রান্ত, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

তিন

হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গবাহী উপন্যাসমালা বিশ্লেষণ করলে কেবল তাঁর শিল্পীসত্তারই নয়, বরং সমগ্র বাঙালি জাতিসত্তার ক্রম-রূপান্তরের ইতিহাসও অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবজীবনের সঙ্কটদীর্ণ ও রক্তাক্ত সত্যস্বরূপ উন্মোচনে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই উপন্যাসসমূহে গ্রহণ করেছেন বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতি; ফলে চরিত্রায়ণরীতিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে ব্যক্তিমানসের দৃষ্টিকোণ, অন্তর্ভাবনা, স্বগতকথন ও মনোবিশ্লেষণ। বস্তু-ঘনিষ্ঠতায় ও পর্যবেক্ষণশক্তির তীক্ষ্ণতায় তাঁর শিল্পীমানস কেবলমাত্র এই উপন্যাসগুলির বহিরঙ্গে রঙ ফুটিয়েই তৃপ্ত থাকেনি, বরং সেই প্রসাদগুণ এই উপন্যাসসমূহের মজ্জায় মজ্জায় সংযত আবেদন, বাহুল্য-বর্জন ও ইঙ্গিতময় সৌকর্যে অন্তর্লীন। বলাবাহুল্য, বহুমাত্রিক ঘটনাপুঞ্জের বিসর্পিত বিন্যাস, চরিত্রসমূহের চেতনাগত ও ভাবগত বিশ্লেষণ, সতত সঞ্চয়িত শীতল পরিবেশ, চরিত্রানুযায়ী আঞ্চলিক ভাষা ও সংলাপের প্রয়োগ এবং সাবলীল উপস্থাপনার প্রাখর্যে হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় ও সমাজমানসের নান্দনিক শিল্পভাষ্য।

Reference :

১. আল আজাদ, আলাউদ্দিন, 'সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু', ১ম সং-১৯৭৪, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৫৭-৫৮
২. আহমেদ, হুমায়ূন, 'শ্যামল ছায়া', ১ম সং-১৯৭৩, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পৃ. ১৩
৩. আহমেদ, হুমায়ুন, 'শ্যামল ছায়া', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
৪. আহমেদ, হুমায়ূন, 'শ্যামল ছায়া', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৫.আহমেদ, হুমায়ূন, 'সূর্যের দিন', ১ম সং-১৯৮৫', অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১১
৬. আহমেদ, হুমায়ূন, 'সূর্যের দিন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
৭. আহমেদ, হুমায়ূন, '১৯৭১', ১ম সং-১৯৮৬', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৮
৮. আহমেদ, হুমায়ূন, '১৯৭১', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
৯. আহমেদ, হুমায়ূন, '১৯৭১', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
১০. আহমেদ, হুমায়ূন, 'অনিল বাগচীর একদিন', ১ম সং-১৯৯২, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২১
১১. আহমেদ, হুমায়ূন, 'অনিল বাগচীর একদিন', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
১২. আহমেদ, হুমায়ূন, 'আগুনের পরশমণি', ১ম সং-১৯৮৬, হাতেখড়ি, ঢাকা, পৃ. ১৩

১৩. আহমেদ, হুমায়ূন, 'আগুনের পরশমণি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১৪. আহমেদ, হুমায়ূন, 'আগুনের পরশমণি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

১৫. আহমেদ, হুমায়ূন 'আগুনের পরশমণি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

১৬. আহমেদ, হুমায়ূন, 'জোছনা ও জননীর গল্প', ১ম সং-২০০৪, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৩৮৪-৩৮৬

Bibliography :

আকরগ্রন্থ :

আহমেদ, হুমায়ূন : 'শ্যামল ছায়া', ১ম সং-১৯৭৩, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

আহমেদ, হুমায়ূন : 'নির্বাসন', ১ম সং-১৯৭৪, খান ব্রাদার্স, ঢাকা।

আহমেদ, হুমায়ূন : 'সৌরভ', ১ম সং-১৯৮৪, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

আহমেদ, হুমায়ূন : 'সূর্যের দিন', ১ম সং-১৯৮৫, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা।

আহমেদ, হুমায়ূন : '১৯৭১', ১ম সং-১৯৮৬, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আহমেদ, হুমায়ূন : 'আগুনের পরশমণি', ১৯৮৬, ১ম সং- হাতেখড়ি, ঢাকা।

আহমেদ, হুমায়ূন : 'অনিল বাগচীর একদিন', ১ম সং- ১৯৯২, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

আহমেদ, হুমায়ূন : 'জোছনা ও জননীর গল্প', ১ম সং-২০০৪, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থ :

অরিন্দম, হাসান : 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ', ২০১৭, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

আজিজুল, হক হাসান : 'একাত্তর : করতলে ছিন্ন মাথা', ১৯৯৫, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আল আজাদ, আলাউদ্দিন : 'সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু', ১৯৭৪, মুক্তধারা, ঢাকা।

ইকবাল, শহীদ : 'বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস', ২০০৯, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

উল আলম, মাহমুদ : 'বাংলা কথাসাহিত্যে যুদ্ধজীবন', ২০০০, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কায়সার, শান্তনু : 'বাংলা কথাসাহিত্য: ভিন্নমাত্রা', ২০০১, ঐতিহ্য, ঢাকা।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ : 'বাংলাদেশের সাহিত্য', ২০০৯, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

চৌধুরী, শামসুদ্দিন : 'উপন্যাসের উপচার', ১৯৯৮, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

মাহমুদ, অনীক : 'সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ', ১৯৯৯, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি', ১৯৮৭, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

মোঃ সাইফুজ্জামান, গাজী: 'বাংলাদেশের উপন্যাসে ভূমি ও মানুষ', ২০১০, মনন প্রকাশ, ঢাকা।

শিকদার, আবদুল হাই : 'বাংলা সাহিত্য : নক্ষত্রের নায়কেরা', ২০০৪, হাতেখড়ি, ঢাকা।

হোসেন, সৈয়দ আকরম : 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', ১৯৮৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।